জ্ঞান তাপস আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রাহ.)

লেখকঃ আহমাদ বিন আব্দুস সালাম

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ

মাস্টার্স; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রাহ.)-এর জন্ম:

বাঙালি মুসলমানকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক পর্যন্ত যে কয়জন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ও প্রতিভাধর মনীষী দক্ষ হাতে লেখনী এবং সংগঠন পরিচালনা করে কোরআন ও অবিমিশ্র সুন্নাহর শাশ্বত জীবন দর্শনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কল্পে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী (রাহ.) চিন্তার স্বকীয়তা ও বলিষ্ঠতায় অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। (মাহেনও, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার টুবা গ্রামে মাতুলালয় ১৯০০ সালে উম্মে সালামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তবে কারো কারো মতে তিনি দিনাজপুর জেলার নুরুল হুদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (থিসিস: মাওলানা আব্দুল্লাহ আল কাফী আল-কুরাইশী (রাহ.): জীবনী,সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম; মোহাম্মদ আব্দুল হক; পৃষ্ঠা-৯৭)

তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল হাদী এবং পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে সৈয়দ রাহাত আলী এবং সৈয়দ বাকের আলী। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের তুস নগরীর অধিবাসী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০২ সালে তার পূর্বপুরুষগণ চট্টগ্রামে আগমন করেন। সৈয়দ আব্দুল হাদী উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস শাইখুল কুল সাইয়্যেদ মিয়া নজির হোসাইন দেহলবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য কিতাবাদী পাঠ করেন। আহলে হাদীস হওয়ার কারণে সৈয়দ আব্দুল হাদী (রাহ.) কে তাঁর পিতা গৃহচ্যুত করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। তাঁর ছিল তিন পুত্র, যথাক্রমে আল্লামা আব্দুল্লাহিল বাকি (রাহ.), মৌলভী মোঃ আব্দুস সালাম (রাহ.), আল্লামা মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) ও চার কন্যা সাইয়্যেদা সাফিয়া (রাহ.), সাইয়্যেদা ফাতেমা (রাহ.), সাইয়্যেদা উম্মে হাবিবা (রাহ.), সাইয়্যেদা আয়েশা (রাহ.)। সৈয়দ আব্দুল হাদী (রাহ.) ১৯০৬ সালে ৬৫ বছর বয়সে দিনাজপুর জেলার করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী নুরুল হুদায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। (আমার দাদাজী; আব্দুল হাদী মোঃ আনোয়ার আল কুরাইশী)

শৈশবকালে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) তাঁর মাতা উম্মে সালামার নিকট প্রাথমিক উর্দূ ও ফার্সি পুস্তক এবং ফিকহে মোহাম্মদীর শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছয় বছর কালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার জীবনী রচনা লিখেছেন: “আমি তার কাছ থেকে গুলিস্তান,হাফেজ ইবনে হাজার আসক্কালানীর বুলুগুল মারাম এর কিঞ্চিত তরজমা অধ্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। (সংক্ষিপ্ত জীবনীলেখ্য; মোঃ আব্দুর রহমান বিএবিটি;৫পৃঃ)

শিক্ষা জীবনঃ

পিতার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহেল কাফী তাঁর এর পিতার প্রতিষ্ঠিত নূরুল হুদা মাদ্রাসায় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, ভগ্নিপতি মওলানা আবদুল মান্নান, বিহারের মওলানা আবদুল্লাহ খান, খুলনার সুফী আবদুর রহমান প্রমুখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ঐ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। শোনা যায়, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালক আবদুল্লাহেল কাফীর একবার মাত্র কোন কিছু শুনলেই তা মুখস্থ হয়ে যেত।

নূরুল হুদা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন শেষে রংপুর শহরে এসে কৈলাসরঞ্জন হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে বছর তিনেক পড়া-লেখার পর চলে যান পশ্চিম বঙ্গের হুগলীতে। সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে চলে আসেন

কলকাতা শহরে। কলকাতার বিখ্যাত মাদ্রাসা আলিয়ার এ্যাংলো-পারশিয়ান বিভাগে অধ্যয়ন শুরু করেন। এই মাদ্রাসা থেকেই তিনি ১৯১৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পাশের পর ভর্তি হন শহরের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। দুই বৎসরে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজেই বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। [মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী; ১৩পৃঃ]

কলেজে অধ্যয়নকালে এক অবিস্মরণীয় ও বিরল ঘটনার দ্বারা এক মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ; কলেজের কোন এক বন্ধে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রাহ.) বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তাঁর ট্রেন কক্ষে এক ইংরেজ দম্পতি সহযাত্রী হলেন। ট্রেন পার্বতীপুর জংশনে থামলে তিনি আসবাবপত্র গোছানোর সময় একটি লেডিস ব্যাগ দেখতে পান। কক্ষের অপর যাত্রীরা পূর্ববর্তী স্টেশনে নেমে গেছে।রেখে যাওয়া ব্যাগ যে ইংরেজ দম্পতির তা বুঝতে তার বেগ পেতে হলো না। তিনি ব্যাগ সযত্নে নিজ ছুটকেসে রেখে দিলেন। কলকাতা রওনা দেওয়ার দু'একদিন আগে তিনি ব্যাগটি খুলেই বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন। দেখেন ব্যাগে প্রায় লক্ষ টাকার নোট ভর্তি। যুবক কাফী ব্যাগটি পূর্বাবস্থায় রেখে দিলেন। তিনি নির্দিষ্ট তারিখে কলকাতায় পৌঁছে কলকাতার প্রসিদ্ধ স্টেটম্যান পত্রিকায় হারানো প্রাপ্তির কলামে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। এরই মধ্যেই ইংরেজ দম্পতি ব্যাগ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। বিজ্ঞাপন দেখে তার ব্যাকুল চিত্তে কলেজ হোস্টেলে বিজ্ঞাপন দাতার সন্ধানে ছুটে যান। প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আব্দুল্লাহিল কাফী ব্যাগটি ইংরেজ দাম্পতির হাতে ফিরিয়ে দেন। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছাত্র আবদুল্লাহেল কাফী-কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগলেন এবং মেমসাহেবা তার অপর ব্যাগ হতে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার একটি মোটা পুরস্কার গ্রহণ করতে তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইংরেজ দম্পতি তাকে উচ্চ শিক্ষার জনের জন্য বিলাতে পাঠাতে এবং সেখানে তাঁর যাবতীয় খরচ বহন করতে তাদের আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাও তিনি গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে তিনি তাদের ঐকান্তিক অনুরোধে তাদের কাছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খন্ডসমূহ নিতে সম্মতি দান করেন। ইংরেজ দম্পতি তাই করেন। আজও উক্ত গ্রহন্থ সমূহ এই ঘটনার স্মৃতি বহন করে মরহুমের আলমারিতে শোভা বর্ধন করছে। [থিসিস ;৯৯পৃঃ]

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) বি.এ. ভর্তি হলেও স্নাতক ডিগ্রী লাভকরা সম্ভব হয় নি। বৃটিশবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ তখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করতে আবদুল্লাহেল কাফীও সেই আন্দোলনে যোগ দেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এভাবেই তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তবে তিনি সারাজীবনই ছিলেন একজন জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। [পূর্বোক্ত;পৃঃ১৩]

১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে তিনি দিল্লিতে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব নবিনা এবং বেনারসের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আবুল কাশেম বানারসী এর নিকট হাদীসের প্রসিদ্ধ সিহাহ সিত্তাহ (الصحاح الستة) কিতাব সমূহ অধ্যায়ন করেন। অতঃপর স্বাধীনভাবে হাদীস তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থরাজি গভীর মনোযোগের সাথে চর্চা ও অনুশীলন করতে থাকেন।[থিসিস;১০৩]

কর্মজীবন:

বৈচিত্রময় জীবনের অধিকারী আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহ.) ধরাবাঁধা বা ধারাবাহিক কোন কর্মে নিয়োজিত থাকেননি। কখনো পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, কখনও বা রাজনৈতীক কর্মকান্ডে বিশেষ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে এমন ভাবে জড়িয়েছেন যে, অন্যকোন কিছু করার সুযোগও ঘটতনা। তবে সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বরাবরই ছিল। যার ফলে একমাত্র এটিকেই তাঁর পেশা হিসেবে দেখানো যায়। কর্মজীবনের শুরুতে আল্লামা মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'আল-হেলাল' (১৯১২-১৯১৪) এবং পরবর্তীতে 'আল-বালাগ' (১৯১৫-১৯১৬) পত্রিকায় যোগ দেন। পরে মাওলানা আকরাম খাঁর উর্দূ দৈনিক 'যামানায়' (১৯২১) সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদেন। কিছুকাল তিনি এটির সম্পাদনাও করেন। এছাড়া তিনি মাওলানা আকরাম খাঁর বাংলা দৈনিক সেবকেও কাজ করেন বলে জানা যায়।

[সাপ্তাহিক আরাফাত;১২জুলাই ২০০৪]

তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যায়ন কাল থেকেই পাক ভারততে সুবিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং তরিকায়ে মোহাম্মদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তিনি মাওলানা আজাদের পরিচালিত কুরআনের তাফসীর মাহফিল গুলোতে নিয়মিত যোগদান করতেন। ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সম্ভাবনাময় উৎসাহী যুবকের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতে এবং জ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে যুবক আব্দুল্লাহিল কাফী (রাহ.) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ.), শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী (রাহ.), মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ (রাহ.), ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা জামাল উদ্দিন আফগানী (রাহ.) প্রমুখ মনীষার আদর্শ ও চিন্তা ধারায় গভীর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হন। আব্দুল্লাহিল কাফী (রাহ.) মাওলানা আজাদের সহচর্য থেকে বিভিন্ন মুখী প্রতিভা বিকাশে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। [থিসিস;পৃঃ১০০-১]

সাংবাদিকতায় অবদানঃ

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) মাওলানা আজাদ এর সম্পাদিত ও উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রসিদ্ধ উর্দূ পত্রিকা আল-হেলাল ও আল-বালাগ পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। আর এখান থেকেই তাঁর মনে সাংবাদিকতা ও পত্রিকার সম্পাদনার স্পৃহা উদিত হয়। খেলাফত আন্দোলনে প্রচার ও প্রসারকল্পে ১৯১৯ সালে খেলাফত কমিটির উদ্যোগে কলকাতার ২৯ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ মুহাম্মদী পত্রিকার অফিস থেকে মাওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় উর্দূ দৈনিক জামানা পত্রিকার প্রকাশ শুরু হলে আব্দুল্লাহিল কাফী এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। আর এখানেই মাত্র ২০ বছর বয়সে তার সাংবাদিকতা ও কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়।

১৯২১ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ ও অন্যতম সরকারি সম্পাদক মাওলানা শেখ আহমদ ওসমানী ব্রিটিশ সরকারের কোপানলে পরে কারারুদ্ধ হলে যুবক আব্দুল্লাহিল কাফী এককভাবে জমানার সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরাম খাঁ স্বয়ং বলেন, “উর্দূ দৈনিক জামানার আমি ছিলাম সম্পাদক আর মাওলানা কাফী ছিল আমার সহকারী। আমার জেলে যাওয়ার পর মাওলানা কাফী সাফল্যের সহিত উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।”

নানা কারণে দৈনিক জামানা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তাঁর একক প্রচেষ্টা ও সম্পাদনায় ১৯২৪ সালের ২১ শে নভেম্বর কলিকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটের ১০/৩ মুসলমান পাড়া লেন থেকে আত্মপ্রকাশ করে “সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী”।

পত্রিকা প্রকাশে সফল হয়েছেন এই আনন্দে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নবী ইউসুফ (আ.) এর মত বলেছিলেন; “এই সেই আমার প্রিয় স্বপ্ন, যাহা আমার পূর্বে দর্শন করিয়েছিলাম এবং নিশ্চয়ই আমার প্রভু ইহা সত্য করিয়া দেখাইলেন।”

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.)-এর দেশ ও জাতির জন্য মনে যে অসহনীয় জ্বালা ও দরদ নিয়ে এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠা চিন্তায় সত্যাগ্রহী প্রকাশ করেছিলেন, তা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রতিভাত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে তাঁর কর্মজীবনে সূচনা হয়েছিল সাংবাদিকতার মাধ্যমে এবং কর্মজীবনের উষাকাল থেকেই তিনি তার আদর্শনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও সমাজ পরিচালনার পরিচয় দেন। তাঁর গোটা জীবন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অম্লান ছিল।

সত্যাগ্রাহী প্রকাশ কালে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য এমনকি শিল্প ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ধর্মভিত্তিক পত্র-পত্রিকা গুলো অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। এতদসত্তেও দেড় হাজার বছর পূর্বে জগতবাসীর সামনে ধর্ম,স্টেট ও সমাজ সম্পর্কে আল কুরআনের প্রদর্শিত আদর্শকে, তিনি সত্যাগ্রহীর আদর্শ বলে   দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। ২৪ বছরের যুবক মাওলানা কাফীর এই বলিষ্ঠ ঘোষণা ধর্মের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস এর পরিচায়ক।

‘সত্যাগ্রহীর’ নিজস্ব কোন প্রেস ছিল না। ইহা প্রথমত কলকাতার ২৯ নং আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত মুহাম্মাদী প্লেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হতো। প্রত্যেক সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গ শিরোনামে সাময়িক বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং জাতীয় ও সামাজিক ব্যাধির উৎপাদনের লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শ থাকতো। আল্লামা কাফী মাত্র তিনজন লোক নিয়েই সত্যাগ্রহী পরিচালনা করতেন। ১৯৮৭ সালের মে-জুন মাসে তার বিশ্বস্ত ম্যানেজার কাজ ছেড়ে চলে গেলে তিনি পত্রিকা প্রকাশনা নিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। দ্বিতীয় বর্ষে ১৯২৭ সালের ৩ আগস্ট এর ৪১ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর মাওলানা প্রবাল আকাঙ্ক্ষা থাকার সত্ত্বেও স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক বিশ্বাস ভজন লোকের অভাবে ও অর্থনৈতিক সংকটে সত্যাগ্রহী প্রকাশ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

সুদীর্ঘ ২২ বছর পর ভারত ভাগ উত্তর স্বাধীন ভূমি পাকিস্তানের ১৩৬৯ হিজরী মহররম মোতাবেক ১৯৪৯ সালের অক্টোবর এ “নিখিল বঙ্গ আসাম জমঈয়ত আহলে হাদীসের” নিজস্ব প্রেস পাবনা হতে তার সম্পাদনায় প্রকাশনা লাভ করে “মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”, তবে প্রচার ও অন্যান্য সুবিধার্থে প্রায় আট বছর পর পত্রিকাটি ১৯৫৬ সালে ডিসেম্বর মাসে পাবনা হতে স্থানান্তরিত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস প্রকাশ হওয়ার পর থেকে এই পত্রিকার নিজস্ব একটি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তাই এর লেখক কে সাহিত্য,ইতিহাস, রাজনৈতীক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও কবিতা প্রকাশের জন্য এর গৃহীত আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনা করতে হতো। এ কারণেই যে সাহিত্য শুধু সাহিত্যের জন্য ছিল, যে ইতিহাসের পেছনে কোন দার্শনিক তথ্য থাকত না, যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি ইসলামের আদর্শ বঞ্চিত এবং বুদ্ধি সহায়ক ছিল না, সেসব রচনা মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে স্থান পেত না। অর্থনৈতিক দৈন্য থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাটি পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য ইসলামবিরোধী ও নীতি নাশক অথচ আকর্ষণীয় কোন বিষয় বস্তু তর্জুমানে পরিবেশন করা হতো না। আর্থিক সমস্যা মোচনের জন্য অশ্লীল ও শরীয়ত বিরোধী কোন বিজ্ঞাপন এই পত্রিকায় স্থান বিজ্ঞাপন খুব কম দেখা যায়। এই পত্রিকার সিংহভাগ জুড়ে থাকতো সাহিত্য, ঐতিহাসিক, রাজনৈতীক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি নানা জাতীয় গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধ। সম্পাদক আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) এর লেখা ছাড়াও এতে অনেক জ্ঞানী গুণী লেখক এর রচনাও পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

প্রায় এক বছর পর ১৯৫১ সালে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট ও আপত্তিকর মনে হলে সরকার তাকে শাসিয়ে দেওয়ার জন্য পাবনা জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মাহতাব সরকারকে আদেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ডেকে নিয়ে ভবিষ্যতে একটু সতর্ক হয়ে লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিদায় দেন। আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) জীবনের শেষ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের সেবায় ছিল নিবেদিত ছিলেন।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) সম্পাদিত চতুর্থ এবং সর্বশেষ পত্রিকার নাম “সাপ্তাহিক আরাফাত” পত্রিকাটি ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর সোমবার ৮৬ নাম্বার কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মার্চ দশম হিজরির ৯ জিলহজ্জ রোজ জুম্মা বারে আরাফাত আরাফার প্রান্তে বিজয় হজে রাসূল (সা:) হজ্জ পালনকারী বিশাল জনসমুদ্রের সামনে যে ঐতিহাসিক বিশ্ব বিখ্যাত ভাষণ দান করেছিলেন, তাই সাপ্তাহিক আরাফাতের চলার পথের লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। আর এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে মহান ব্রত নিয়ে আরাফাতের যাত্রা শুরু হয়।

পাঠকদের নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আরাফাতের প্রথম সংখ্যায় মহানবী (স:) এর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়।

দেশের সে সময়ে বেশকিছু সংখ্যক পত্র পত্রিকা প্রচলিত থাকার সত্ত্বেও যে পটভূমিতে আরাফাত প্রকাশ করতে হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) আরাফাতে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে দ্বিধাহীন চিত্তে বলেন; *“যাহারা আদর্শ বঞ্চিত ও সাংবাদিকতার পক্ষপাতী, তাহারা আমাদের এই প্রয়াসকে নিরর্থক বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তাহাদের আদর্শহীন সাংবাদিকতাকেই শুধু অনর্থক নয় অন্যায় বলিয়াও বিশ্বাস করিয়া থাকি। অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব সংবাদপত্রের নীতি ভ্রষ্ঠতাকে আমরা সাংবাদিকতার পক্ষে কলঙ্ক এবং সাংবাদিক দুর্নীতি বলিয়া জানি। আজ যতগুলি সংবাদপত্র সমাজে পরিবেশিত হইতেছে দুর্ভাগ্যবশত সেগুলি কতক অন্তসারশূন্য ও আদর্শ বিবর্জিত আর যেগুলি নীতি পরায়ণ সমস্তই স্ব-স্ব কেন্দ্রিক একটিও ইসলাম কেন্দ্রিক নয়। দল ও ফিরকা বিশেষের আদর্শ নয়, কাহারাও ইমামত ও নেতৃত্বের জয়গান নয়। আমাদের আদর্শ হইবে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ।”*

মহিলাদের ইসলামী আদর্শের জ্ঞান চর্চা করার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে আরাফাতে “খাওয়াতিনে ইসলাম” নামে পৃথক একটি স্তম্ভের ব্যবস্থা ছিল এবং এই স্তম্ভে কোন কোন সময় মহিলাদের লেখা বের হতো।

এতদ্দ্বার সত্ত্বেও এই স্বল্পকালীন সময়ে জনকল্যাণমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে এবং জাতীয় সমস্যা গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সাপ্তাহিক আরাফাত যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেছিল তা সমসাময়িক নিরীক্ষকদের মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়।

দৈনিক আজাদের তৎকালীন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পর্কে বলেছিলেন; “এটি মাওলানা কাফীর সম্পাদনায় একটি উচ্চারঙ্গের ধর্মীয় পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল।” [থিসিস;পৃঃ১৮৩-২২০]

<u>সংগঠক ও রাজনৈতীক জীবনঃ</u>

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছিলেন একজন দক্ষ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ সংগঠক। রাজনৈতীক থেকে শুরু করে ধর্মীয়, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা সংগঠন তিনি করেছেন, গড়েছেন। এর পিছনে তাঁর মহান লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করে তথাকথিত কোন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নয়, বরং একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাঁর জীবনে রাজনীতির প্রবল তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতের অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ,দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেত সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ. কে.ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে আল্লামার ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি যখন কারাগারে বন্দী ছিলেন সেই সময়ও মাওলানা আযাদ তাঁকে চিঠির মাধ্যমে কর্মপদ্ধতি অবহিত করতেন। কিন্তু এত সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আল্লামা মরহুম কখনো আপন লক্ষ্যও উদ্দেশ্য থেকে পিছু হটেন নি। বলতে গেলে জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় রাজনীতির ডামাডোলে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। রাজনীতির সহজ জনপ্রিয়তা তিনি কোন দিনই চাননি। তাই দেখা যায় প্রচার বিমুখ এই মহান ব্যক্তি পর্দার অন্তরালের অনেক ঘটনার নায়ক অথবা সাক্ষী থাকলেও সেই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেননি। তাঁর চেয়ে কম যোগ্যতার অধিকারী সমসাময়িকদের অনেকেই রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেছেন। আল্লামা মরহুম নীতি ও

আদর্শের ক্ষেত্রে ছিলেন আপোষহীন ও অটল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র থাকাকালীন খেলাফত আন্দোলনে যোগদান থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এগুলো হলঃ

১. খেলাফত আন্দোলন ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে আল্লামা মরহুমের সাংগঠনিক জীবনের শুরু হয়। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে আল্লামা আবুল কালাম আযাদ তাঁকে কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

২. জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দ: মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১৮৫১-১৯২০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আল্লামা আল-কোরায়শী জড়িত ছিলেন বেশ কিছু কাল।

৩. জমঈয়তে উলামায়ে বাঙ্গালা: ১৯২২ সাল হতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আল্লামা মরহুম এ সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

৪. ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী। তিনি এর ইলেকশন বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হন।

৫. আঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাঙ্গালা ও আসাম: সক্রিয় রাজনীতির পাশাপাশি ১৯২৭ সাল থেকে মাওলানা এ সংগঠনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এরই উদ্যোগে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রংপুর ও জামালপুর প্রভৃতি স্থানে আয়োজিত বহু জনসমাবেশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

৬. মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি: ১৯৩০ সালে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী মাওলানা আযাদের প্রতিষ্ঠিত এ পার্টিতে যোগদান করেন এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

৭. কৃষক-প্রজা পার্টি: ১৯৩৫ সালে মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী শেরে বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদান করেন।

৮. নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস: (পরবর্তীতে ১৯৪৭সালের দেশ বিভাগের কারণে "পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস" এবং ১৯৭১ সালের দেশ বিভাগের কারণে (বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" নাম করণ করা হয়) : এতদঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিচালিত আহলে হাদীস আন্দোলন সমূহকে এককেন্দ্রিক রূপদানের মাধ্যমে তিনি এ জমঈয়ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সে আল্লামা মরহুম পরপর দু'বার বিশেষ আমন্ত্রণে যোগদান করেন এবং অগ্নিঝরা বক্তব্য দান করেন- যা সুধী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ও প্রেরণায় ১৮,১৯,২০ এপ্রিল ১৯৪৬ সালে রংপুরের হারাগাছ এলাকায় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় আল্লামার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্লামা আবদুল্লাহেল বাকীর সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার ১৯টি ও আসামের ৫টি জেলা এবং বিহার হতে আহলে হাদীস প্রতিনিধি এবং উপমহাদেশের বহু প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম অংশ গ্রহণ করেন। এই কনফারেন্সেই গঠিত হয় নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস। আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী নির্বাচিত হন এর প্রথম সভাপতি। কলকাতার মারকুইস লেনস্থ মিসরীগঞ্জ আহলে হাদীস মসজিদে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপিত হয়।

জমঈয়ত গঠনের মধ্য দিয়ে যেন আল্লামার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল। তিনি তাঁর সমস্ত যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, মেধা, অভিজ্ঞতা আর দরদ ঢেলে দেন এই জমঈয়তকে গতিশীল করতে। তাঁর সাংগঠনিক জীবনে এল পূর্ণতা। জমঈয়ত গঠনের পরবর্তী এক যুগেরও অধিক সময় আল্লামা 'একনিষ্ঠ ভাবে আহলে হাদীসদের সংগঠন উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বক্তব্য-বিবৃতি, সফর, সাহিত্যচর্চা, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতি সকল পদ্ধতিই এ ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেছেন। ফলে মাত্র কয়েক বছরেই জমঈয়ত দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হল।১৯৪৯ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় জমঈয়তের সহযোগী

প্রতিষ্ঠান হিসেবে আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ নামক একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা মরহুম আমৃত্যু জমঈয়তের সভাপতি হিসেবে গতিশীল নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। [সাপ্তাহিক আরাফাত; ৪৫বর্ষ ৪৬-৪৭ সংখ্যা]

রাজনৈতীক দর্শনঃ

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) এর স্বপ্ন ছিল এই দেশ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্র হবে এবং এখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ইসলামী স্টেট কায়েম হবে। এই লক্ষ্যে তাঁর ছিল কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গুলোর মধ্যে বর্ণিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতীক দর্শন। তাঁর এই রাজনৈতীক দর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ থিসিসের বা উচ্চাঙ্গের গবেষণার অবকাশ রাখে। এই প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতীক দর্শনের সামান্য ধারণা প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে তাঁর রাজনৈতীক দর্শন নিয়ে গভীর পাঠ, পর্যালোচনা ও আলোচনা হবে বলে আশা রাখছি।

ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতীক ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী ছিল এক চরম সন্ধিক্ষণ। একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় থেকে মুক্তির আকুলতা, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর হারানো শৌর্য পুনরুত্থানের প্রশ্নে নানা মতাদর্শিক সংঘাত—এই দ্বিবিধ বাস্তবতায় যে ক'জন মনীষী সমাজ ও রাজনীতিকে কুরআন ও সুন্নাহর অভ্রান্ত দর্পণে বিচার করার সাহস দেখিয়েছিলেন, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহ.) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। একজন প্রাজ্ঞ সাংবাদিক, ঋদ্ধ লেখক এবং দূরদর্শী রাজনৈতীক নেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি কেবল একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা মতাদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি ছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা ও ইসলামী জীবনদর্শনের এক অনন্য সমন্বয়ক। আল্লামা কাফীর রাজনৈতীক দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন', যা কেবল একটি ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টা নয়, বরং জীবন ও জগতের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এক সর্বাত্মক সংগ্রাম।

তাঁর রাজনৈতীক জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল ব্রিটিশবিরোধী উত্তাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ছাত্রাবস্থায় তিনি অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং ব্রিটিশ রাজের রোষানলে পড়ে ১৯২৭ সালে কারাবরণ করেন। *মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মাওলানা আকরম খাঁ-র মতো বরেণ্য নেতাদের সাথে তাঁর কর্মতৎপরতা তাঁকে রাজনীতির জটিল সমীকরণ বুঝতে সহায়তা করেছিল।* আহলে হাদীস আন্দোলনের রাজনৈতীক হীনমন্যতা ও দৈন্যদশার প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রবর্তিত রাজনৈতীক দর্শন ও চিন্তা ধারা ভারত উপমহাদেশীয় মুসলমান ও বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের বোঝা এবং সেই অনুযায়ী রাজনৈতিক ফিল্ডে কাজ করা অত্যন্ত জরুরী এবং একান্ত কর্তব্য।

ক) রাজনীতির সংজ্ঞা ও অপরিহার্যতা

আল্লামা কাফীর রাজনৈতীক দর্শনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক দিক ছিল রাজনীতির ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংজ্ঞায়ন।বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতীক চিন্তা দর্শনের এবং প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা এবং নানা ধরনের ফতোয়া আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে এবং এর ফলশ্রুতিতে তরুণ সমাজ পঙ্গপালের মতো নানান দিকে নানান মতে ছড়িয়ে পড়ছে। এই করুণ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। আধুনিক সেকুলার বিশ্বে যখন ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছিল, তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজনীতি একজন মুমিনের ঈমান ও আমলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মতে, *"কবরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত রাজনীতির প্রভাব এড়াইয়া চলার উপায় নাই, অধিকন্তু ইসলামী রাজনীতি ঈমান ও আমলে ছালেহেরই অপরিহার্য অংশ"।*[মাসিক তর্জুমানুল হাদীস;৭ম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা]

এই দর্শনের মূলে রয়েছে তাওহীদের সেই সুগভীর ধারণা, যা কেবল মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকেও শাসন করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, যদি রাজনীতিকে ধর্মের বাইরে রাখা হয়, তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন শক্তির উত্থান ঘটবে যারা মহান আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েম করবে। ফলে, আকিদা রক্ষা এবং দ্বীন পালনের পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থেই রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা মুমিনের জন্য কেবল অধিকার নয়, বরং দায়িত্ব।

ভারত উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে দেখা যায় যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতীক ময়দানে প্রবেশ করে তখন তিনি দাসত্বের শৃংখলে জর্জরিত হয়ে পড়েন আর এই বাস্তবতা অনুধাবন করেই তিনি প্রায় শত বছর পূর্বে আহলে হাদীস কম কে পথ দেখিয়ে গেছেন।তিনি সরব স্বরে সতর্ক করেন,

"খবরদার! কারুই কোন দাসত্ব বরণ করতে যেয়ো না, ইসলাম এসেছে দুনিয়াকে দাসত্বের নিগড় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। দাসত্ব দুই প্রকার এক দৈহিক, দুই মানসিক।"
এই উক্তিতে কাফী সাহেব আল্লাহর দিক থেকে ন্যায় ও মানব-মুক্তির অপরিহার্যতা উপস্থাপন করেছেন। ইসলামের সারমর্মেই মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় শোষণ-বাঁধন ভেঙে দেয়ার বক্তব্য রয়েছে। কাফী সাহেব মনে করতেন, মুসলিমরা শারীরিক দাসত্বের পাশাপাশি অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত মানসিকতার বন্দিদশা থেকেও স্বাধীন হতে হবে। তাঁর রাজনৈতীক দর্শনে ইসলামের উদ্দেশ্য দুনিয়াকে অবৈধ অবলীলাময় শাসনের শৃঙ্খল মুক্ত করে বিশ্ব মানবসমাজে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম তাওহীদ, সুন্নাহ অনুসরণ এবং আল্লাহর পূর্ণ আত্মসমর্পণের ওপর গভীরভাবে নির্ভর করে।কারণ দাসত্ব শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোন ক্ষমতা বা দল বা গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নয়।

আল্লামা কাফী সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী তত্ত্ব প্রদান করেন, যাকে তিনি ‘পার্লামেন্টারি মাজহাব’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, “অধিকাংশ মুসলিম রাজনৈতীক নেতা ও দল কেবল ক্ষমতা দখল, মন্ত্রিসভা গঠন এবং সংসদীয় আসন জয়ের লক্ষ্যেই রাজনীতি করেন। একে তিনি একটি ভ্রান্ত ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর দর্শনে রাজনীতি হলো সত্যের সাক্ষ্য প্রদান এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের একটি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম।” [মাসিক তর্জুমানুল হাদীস;৭ম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা]

তিনি আহলেহাদীছ জামা’আতকে একটি গতানুগতিক রাজনৈতীক দলে রূপান্তরিত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি জমঈয়তকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতীক দলের আজ্ঞাবহ লেজুড়ে পরিণত করার চেয়ে সংগঠনটির অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়াকেও শ্রেয় মনে করতেন। তিনি রাজনীতির নামে নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। [পূর্বোক্ত]

তিনি সমকালীন মুসলিম সমাজের অসুখপ্রবণতাও তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। কাফী সাহেব দেখান আমাদের অবস্থা এখন কচুরি পাতার মতো বাতাস যেখানে ঠেলে দেবে সেখানেই ভেসে যাওয়া। তিনি বলেন, "আজ আমাদের অবস্থা হয়েছে কচুরিপানার মত, পাল সবসময়ই খাড়া, যেদিকে বাতাস ঠেলবে সেই দিকে চলতে শুরু করবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে আমাদের কারুই একটু বাধে না।"
এখানে তিনি সমাজের দিশাহীন চিন্তা-চর্চা ও নেতৃত্বের অভাবের চিত্র তুলে ধরেছেন। ওই প্রসঙ্গে তিনি সতর্ক করেন যে ক্রমশ বড় রাজনৈতীক দলগুলোতেই নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার অশুদ্ধিতে নীতির উৎকর্ষ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বিদ্রুপ করে বলেন:
"আজ সবাই কমরেডের দল। বড় কমরেড নিজেও নিতিচ্যুত। ছোট কমরেডও রেহাই পাবে কীভাবে? শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা নীতিতেই গলৎ।"
এই উক্তি থেকে বোঝা যায় কাফী সাহেব সাম্যবাদী বা বামপন্থী তত্ত্বের নাম করে সমগ্র শ্রেণী-সংঘটনাকে টেকসই হিসাবে অস্বীকার করেন। তার মতে, শিক্ষা ব্যবস্থার ভুল নীতিগুলি মানুষকে প্রকৃত ইসলামী চিন্তা থেকে বিচ্যুত করেছে। তিনি যৌক্তিক যুক্তিতে দেখান, সমগ্র সমাজ ও রাজনীতি যদি নির্দলীয় (No-Party) বা নীতি-পালনের চর্চায় এগিয়ে না যায় তবে জাতির উন্নয়ন বরদাস্তযোগ্য হবে না। আহলেহাদীস আন্দোলন এই প্রেক্ষাপটগুলোতে কাজ করেছে যা “কেবল কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ” করে।

খ) আহলেহাদীস আন্দোলনের দর্শন

আবদুল্লাহিল কাফী আহলেহাদীস আন্দোলনের অবস্থান ও নীতিকেও স্পষ্ট করেন। তিনি বারবার জোর দেন যে আহলেহাদীস কোনো নতুন মাযহাব বা সংস্কারচিন্তার খাতায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন তিনি বলেছেন:

"আহলে হাদীসের সম্পর্কে সর্বপ্রথম ইহা অবগত আবশ্যক যে আহলে হাদীস কোন মাযহাব বা ফির্কার নাম নয়।"
এই উক্তি নিশ্চিত করে যে আহলেহাদীস আন্দোলন ধারাবাহিক ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসারী, কোনো নতুন ধারা নয়। একই ভাবাপন্নতায় তিনি বলেন:
"আহলে হাদীসগণ রাসূল (স.)-এর একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যক্তিত্ব উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন মহাপুরুষের উদ্ভাবিত আকীদা ও সিদ্ধান্তকে আহলে হাদীসগণের আকীদা এবং মাযহাব রূপে গ্রহণ করে নাই।"
এতে স্পষ্ট যে আহলেহাদীসগণ কোনো ব্যক্তিগত তত্ত্ব বা গোষ্ঠীর নির্দেশকে ধর্মীয় আইন বা বিশ্বাসের সমতুল্য মনে করে না। তারা কেবল কুরআন ও সুন্নাহকে আলাদা করে গ্রহণ করে; অন্য বাৎসরিক নেতা বা স্বঘোষিত গুণীজনের প্রতিফলিত সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহ্র শাসন এবং রাসুলের নেতৃত্বের স্বীকৃতিও আহলেহাদীস আন্দোলনের মূলপ্রতিপাদ্য। যেমন তিনি ঘোষণা করেন:
"আহলে হাদীস আন্দোলনের মূলনীতি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ' অনুসারে আহলে হাদীসগণ তাহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপক রূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভূত্ব এবং মনুষ্য শ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রাসুল (সা.) এর অধিনায়কত্ব স্বীকার করে লইতে বাধ্য।"
এই ঘোষণায় কাফী সাহেব ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আহলেহাদীসরা যেমন কুরআন-হাদীসের বঞ্চিত কোনো নীতি মানতে অস্বীকৃতি দেয়, তেমনই কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে মেনে নেয়। আদতে এই দর্শন ইসলামের বিশুদ্ধ একত্ববাদ ও প্রেরিতুদ্দিষ্ট পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে।

আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যবস্তু নিয়েও কাফী সাহেব কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সময় ও পরিবেশের যেকোন পরিবর্তন মানবেন এবং সমাধান খুঁজবেন কোরআন ও সুন্নাহয়; অন্য কোন গোঁড়ামির বিধান নয়:

"বিভিন্ন ফির্কা ও দলের ন্যায় আহলেহাদীস আন্দোলন মানব সমাজের নিত্য নূতন প্রয়োজন ও যুগধর্মের দাবী কে অস্বীকার করে না। আহলেহাদীস আন্দোলন কোরআন ও সুন্নাহ কে ভিত্তি করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের যুগোপযোগী সমাধানের অবকাশ সকল সময়েই রহিয়াছে।"
এখানে তিনি আহলেহাদীসদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানান, যা যুগের চাহিদা ও নতুন সমস্যাকে মোকাবিলায় মুক্তমনা। একই সঙ্গে দেশ ও জাতির কল্যাণে যে কোনো ন্যায়সংগত আন্দোলনে মুসলিম জনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বও তুলে ধরেছেন:
"দেশ এবং জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যানের জন্য সকল প্রকার ন্যায়ানুমদিত আন্দোলনে মুসলিম জনগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের অন্য দশজনের ন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াই ইহার পরিগৃহীত কর্মপন্থা।"
এমন কর্মপন্থা অনুসারে আহলেহাদীস অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেকোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে অংশ নেবেন এবং মানবতার উজ্জীবনে কাজ করবেন।

এই আন্দোলনের সর্বোপরি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। কাফী সাহেব স্পষ্ট বলেন:

"দেশের সকল প্রকার রাজনীতি কে ইসলামী রূপ প্রদান করা এবং কোরআন ও সুন্নাহ কে ভিত্তি করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। খিলাফতে রাশিদার

আদর্শের ইসলামি রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন সাধন আহলেহাদীস আন্দোলনের লক্ষ।"

তাছাড়া বলা হয়েছে, রাসূলগণের প্রবর্তিত রাষ্ট্রদর্শন অনুসারে কাফী সাহেব ১৯৪৭ পরবর্তী নবগঠিত পাকিস্তান-কে একটি আদর্শিক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েছিলেন যা একমাত্র তাওহীদ, সাম্য ও ন্যায়বিচার দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সব বক্তব্য স্পষ্ট করে যে কাফী সাহেবের রাজনৈতীক দর্শন ইসলামের আদর্শিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় নিবদ্ধ, যা যুক্তিযুক্ত সমাজশাসন, সামাজিক সমতা ও খিলাফতের যুগোত্তীর্ণ আদর্শকে পুনর্জাগ্রত করার উপর গুরত্ব দেয়।

গ) ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রের কাঠামো

আল্লামা কাফীর রাজনৈতীক দর্শনের এক অনন্য দলিল হলো তাঁর রচিত "ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" "পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" "চল্লিশ প্রশ্নের জবাব"। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর যখন একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তখন তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোর প্রস্তাবনা দেন। তাঁর এই দর্শন কেবল তাত্ত্বিক ছিল না, বরং তা ছিল অত্যন্ত প্রয়োগমুখী। ১৯৫৯-৬০ সালে পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশন যখন বিভিন্ন মনীষীদের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নমালা প্রেরণ করে, তখন মুমূর্ষু অবস্থায়ও তিনি সেই জবাবগুলো তৈরি করেছিলেন।

আল্লামা কাফী সাহেবের দল নীতিবাদ, সাংগঠনিক কেলেঙ্কারী ও ব্যক্তিগত দুর্নীতিকে কঠোর সমালোচনা করেন। কুরআন শাসনের অধীনেই রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনার পক্ষে তিনি দৃঢ় ছিলেন। তাঁর ভাষ্যে:

"তাহলে সর্বপ্রথম ভন্ডামি ও মুনাফিকি পরিহার করুন, দলাদলি পার্টি পলিটিক্স কোন্দল কোলাহল কাঁদা ছোড়াছুড়ি পরিত্যাগ করুন, সমাজ জীবন থেকে শ্রেণীবিভেদের অভিশাপ বিদূরিত করুন এবং কুরআনের সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে রূপায়িত করার জন্য সকলে মিলে অগ্রসর হোন।"

এই আহ্বানে কাফী সাহেব পুরোপুরি মুসলিম সমাজে অপবাদ ও শ্রেণী বিদ্বেষ দূর করে কুরআন-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার তাগিদ জানান। বাস্তবায়নের লক্ষে তিনি দলগত রাজনীতির বদলে নৈতিক সুসংগঠিত সমাজ গড়তে মনোযোগ দিতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আহলেহাদীস আন্দোলনের মূলমন্ত্র "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" অনুযায়ী সব কার্যকারিণীর উপরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবন-ব্যবস্থায় কেবল কুরআন-সুন্নাহর আইন গ্রহণেই ঐক্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা অগ্রাধিকারের – যা কুরআন ও হাদীসকে সব বিচার-বিবেচনার একমাত্র কর্তৃত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে।

কাফী সাহেবের গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিষয়ক চিন্তাধারায় স্পষ্ট যে তিনি মনে করতেন ইসলাম একটি সর্বব্যাপী রাজনৈতীক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে, যা বাস্তবায়নে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ছে। তিনি উদ্বেগভরে বলেন:

"ইসলাম একটি রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম মানুষকে প্রদান করেছে। দুঃখের বিষয় বাউল, ন্যাড়া, বামুন, সুফী আর খ্রিস্টানদের প্রভাবে আর পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় ইসলামের প্রকৃত তালিম, নীতি-নৈতিকতার মান, তার রাষ্ট্রীক ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে মুসলমানগণ না-ওয়াকেফ হয়ে পড়েছে, ইসলামের শুভ্র সমুজ্জল জ্যোতিঃ আজ ছাই চাপা পড়ে গেছে।"

এই বক্তব্যে কাফী সাহেব বক্তিতাপ্রবৃত্তদের মতাদর্শের প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষার অজ্ঞামযতা ও ইসলামজীবী সংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রতি শোক জানিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে উপমহাদেশের মুসলমানরা ইসলামিক শাসনব্যবস্থা ও নৈতিক আদর্শকে ভুল বোঝা, উপেক্ষিততা ও বিভ্রান্তির স্বীকার হয়েছেন। তিনি দৃঢ় করে মনে করতেন যে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত না করলে মুসলিম জনতার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে যাবে। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা "পুরোধামূলক" হওয়া এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে কুরআন-সুন্নাহর নীতিমালা প্রতিষ্ঠাই

মূল লক্ষ্য হতে হবে। কাফীর এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে আহলেহাদীস মতাদর্শের এক শরীরবদ্ধ চেতনা, যা মুসলিম সমাজে জাগরণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতির ওপর জোর দেয়।

ঘ) গণতন্ত্র ও বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনৈতীক দৃষ্টিভঙ্গি

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লামা কাফীর বিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক এবং আলোচনা মূলক ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভুল ত্রুটির সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি ছিলেন সোচ্চার সমালোচনামূলক। তিনি ১৯৪৯ সালেই তাঁর সম্পাদিত 'তর্জুমানুল হাদীছ' পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, "খোদ ইউরোপ ও আমেরিকার নেতারাই প্রচলিত গণতন্ত্রের বিষময় ফলের কথা স্বীকার করে নিতে শুরু করেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো সত্য-মিথ্যা বা ন্যায়-অন্যায়কে কেবল 'সংখ্যাধিক্যের' নিক্তিতে পরিমাপ করা।"

তিনি গণতান্ত্রিক নির্বাচন বা জনমত ও ভোট প্রদানকে অস্বীকার করেননি; বরং তিনি চেয়েছেন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ভোটার ও প্রার্থী উভয়েরই নৈতিক ও আদর্শিক যোগ্যতা থাকবে। তাঁর নির্দেশ ছিল—যারা কুরআন, সুন্নাহ এবং জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তারা কখনোই মুসলিমদের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য নয়। তৎকালীন সময়ে নবগঠিত পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন; "রাসূলগণের অধিপতি মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) প্রবর্তিত রাষ্ট্রদর্শ অনুসারে পাকিস্তানের ছরযমীনে তাওহীদ,সাম্য ও ন্যায়বিচারের এক অতুলনীয় গনতান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।"
তাঁর এই দর্শন থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে যেসব অঞ্চল গুলোতে সরাসরি ইসলামী খেলাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং গণতান্ত্রিক সহ আধুনিক বিশ্বের যতগুলো প্রচলিত শাসনব্যবস্থা রয়েছে সেগুলোর সাথে ইসলামের রয়েছে অনেক বড় মৌলিক পার্থক্য এবং সাংঘর্ষিক অবস্থান।তাই তিনি ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও আধুনিক বিশ্বের নানান ধরনের শাসনব্যবস্থার মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে ইসলামের আলোকে কোরআন ও সহীহ হাদীসের নিকটবর্তী এমন একটি শাসনব্যবস্থার দার্শনিক তত্ত্ব হাজির করেছিলেন যার সাথে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার খুব বড় কোন মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না। তবে তার স্বপ্ন ছিল একটি ইসলামিক স্টেট কায়েম করে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করা যার লক্ষ্যে তিনি রাজপথ থেকে লেখনি পর্যন্ত সর্বস্থানে খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন।
ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশীয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে পার্লামেন্টারি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আহলে হাদীস আন্দোলনের অবস্থান অবস্থান কী হবে এবং আহলে হাদীস আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে আহলে হাদীসগণের একাত্মতা পোষণ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে কাফী সাহেব বলেন; *"গণতান্ত্রিক 'শূরার' অনুসরণ করিয়া নূতন পরিচালক, নূতন কমিটি সহজেই গঠন করা যাইতে পারে। অতএব কোন আহলেহাদীসের পক্ষে ইহার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আহলেহাদীস জামা'আত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়।"*

আল্লামা কাফী কেবল শাসনব্যবস্থা নিয়েই ভাবেননি, বরং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রশ্নেও তাঁর দর্শন ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। তাঁর রচিত "ধন বণ্টনের রকমারি ফর্মুলা" এবং "আল-ইসলাম ও কমিউনিজম" গ্রন্থ দুটিতে তিনি তৎকালীন বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন কমিউনিজম বা সাম্যবাদ একটি বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, তখন বাংলার মুসলিম মানসে এর প্রভাব লক্ষ্য করে আল্লামা কাফী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কমিউনিজম কেবল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি ধর্মহীন জীবনদর্শন যা মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা ও আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদ একচেটিয়া সম্পদ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে সমাজে চরম বৈষম্য তৈরি করে।

তাঁর দর্শনে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: ১. ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি ও নিয়ন্ত্রণ: ইসলাম মানুষকে সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার দেয়, কিন্তু সেই সম্পদে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির অধিকার (যাকাত ও সদকা) নিশ্চিত করে। ২. শোষণের অবসান: সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে তিনি সকল অর্থনৈতিক অনর্থের মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং একে উচ্ছেদের দাবি জানিয়েছেন। ৩. সম্পদ

পুঞ্জীভূতকরণের বিরোধীতা: পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার প্রথাকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

ঙ) আহলেহাদীস আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদেয়া সম্পর্কে তাঁর অবস্থান:
কাফী সাহেবের রাজনৈতীক দর্শনের একটি অত্যন্ত আলোচিত অধ্যায় হলো মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদীর নেতৃত্বাধীন 'জামায়াতে ইসলামী' (যাকে তিনি 'ইসলামী জামাআত' বলতেন) সম্পর্কে তাঁর পর্যালোচনা। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামীর পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো অত্যন্ত নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

ইসলামের নাম ব্যবহার করে অথবা ইসলামের নাম বিহীন যে সকল রাজনৈতীক দলগুলো ময়দানে অবস্থান করছে তাদের দিকে ঝুকে পড়া বা বর্তমান সময়ের আলেম-ওলামা ও তরুণ যুবকদের মাঝে বিশেষ কয়েকটি দলের দিকে ঝুকে পড়া এবং তাদের রাজনৈতীক কর্মকাণ্ড গুলোকে ইসলামিক রাজনীতি মনে করা ও তাদের রাজনৈতীক দলের সাথে যুক্ত হওয়াটা আহলে হাদীস আন্দোলন এর কর্মীগণের জন্য কোন পদস্খলন নয় এমনটি যারা মনে করেন তাহাদের জন্য রাজনৈতীক দার্শনিক অবস্থান থেকে স্বতন্ত্রতা এবং আহলে হাদীস আন্দোলনের সাথে অন্যান্য রাজনৈতীক দলের আদর্শগত পার্থক্য তুলে ধরে বলেন;
"যেসকল আহলে হাদীস যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন রাজনৈতীক দলে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে আহলে হাদীসদের আদর্শগত এবং জামা'আতী স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছুই নাই, তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আহলে হাদীসদের সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছেন মাত্র। একান্তই যদি কোন রাজনৈতীক দলে কেহ ভিড়িয়া যাইতে চান, শুধু নির্বাচনী স্বার্থের খাতিরে এরূপ করা বিশ্বাসঘাতকতামূলক হইবে, অবশ্য জামাআতের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে এরূপ করা চলিতে পারে।" [মাসিক তর্জুমানুল হাদীস;৭ম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা]
তিনি আরো বলেন; *কোন আহলেহাদীসের পক্ষে ইহার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আহলেহাদীস জামা'আত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়।"*

কাফী সাহেবের রাজনৈতীক দর্শনে আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র আধিপত্য ও সর্বভূমিকে তাঁরই শাসন হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মুখ্য। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে আল্লাহ'র রুবুবিয়ত (পালনকর্তা), উলুহিয়াত (ইবাদত) ও মালিকিয়ত (সর্বস্বত্ব) এর গুণাবলী বাস্তবায়ন করাই ইসলামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। তাঁর ভাষ্যে,

"আল্লাহর রুবুবিয়ৎ, উলুহিয়াত ও তাঁর মালিকীয়তের গুণ (ছেফাত) কে কার্যক্ষেত্রের রূপায়িত করে দুনিয়ার সমস্ত যুলুম ও মানুষের মেকি প্রভুত্বের নির্বাসন ঘটিয়ে বিশ্ব-প্রভুর একচ্ছত্র আধিপত্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দুনিয়ার বুকে ইসলামের আবির্ভাব।"
এই বক্তব্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, মানব জাতির মধ্যে ঐক্য ও বৈশ্বিক মানব-ভ্রাতৃত্বকে সম্মান করার আহ্বান দেওয়া হয়েছে। কাফী সাহেব বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেবল পৃথক জাতি-ধর্ম ভিত্তিক নেতৃত্ব নয়, বরং "বিশ্ব প্রভু" যিনি সমগ্র সৃষ্টি পরিচালনা করেন, তাঁর আদেশ মেনে বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও হাদীসময় জীবনাচরণের মূলনীতিকে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজের অবিচার ও দাসত্ব নির্মূল করে সাম্যবাদের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে – যা কুরআনকে সমাজ-ব্যস্থাপনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) জনসাধারণের নৈতিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। তার ভাষায়,
"কেবল সিনেমা, বেশ্যালয়, পানশালা গোলজার করে প্রবৃত্তি পরায়ণতা ও পশু বৃত্তির চরিতার্থতা দিয়ে কোন জাতি ধরা পৃষ্ঠে টিকে থাকতে পারে না।"
এখানে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি-পরায়ণতা, নৈতিক অবক্ষয় ও অমর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সহিংস নিন্দা রয়েছে। ইসলাম শাসিত সমাজে ব্যক্তিগত নাৎসিকতা, অপসারণীয় মদ্যপান বা দেহবিক্রি প্রলুব্ধতা থাকতে পারে না – এটাই কাফী

সাহেবের উপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্ভবত এও বোঝাতে চান যে, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক বিনোদনের সঠিক ব্যবহার ছাড়া মানুষ প্রকৃত নেতৃত্বের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারবে না।

রাজনৈতীক সূত্রে কাফী সাহেব বিদেশী শোষণ ও দায়িত্বহীন শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামবিধি নিয়ে বলিষ্ঠ প্রস্তাব দেন। তিনি সর্বসম্ভাব্য সকল সামরিক ও আত্মরক্ষার শক্তি সংরক্ষণ এবং যুদ্ধ কলায় নিরন্তর দক্ষ হতে প্রাধান্য দেন:

"সম্ভাব্য সকল প্রকার শক্তির অনুশীলন দ্বারা প্রস্তুত থাকো। সর্বপ্রকার যুদ্ধ কৌশল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে শক্তি সঞ্চয় কর শুধু প্রয়োজনের সময় নয় সকল সময়ে।"
কাফী সাহেব মুসলিম জাতিকে 'শক্তিশালী মিলিটারি জাতি'র সন্ধানে বিশ্বাসী দেখান। তিনি আরও উদ্বুদ্ধ করেন,
"মুসলিম দিগকে একটি শক্তিশালী মিলিটারি জাতি রূপে টিকে থাকতে হইবে। মুসলমানগণ জাতিগতভাবে মিলিটারি সামরিক জাতি।"
উপরিউক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়, তিনি মুসলিম উম্মতকে ঐতিহাসিক ঐক্যবদ্ধ সামরিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে উত্সাহিত করেন। আহলেহাদীস আন্দোলনে বিশ্বাস করা হয় যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাকালেই সাহাবা সাহস ও সামরিক কৌশলে অনন্য ছিলেন – তাই সমাজ-রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা শক্তি ত্যাগযোগ্য নয়। এ কথা আমলে নিলে কাফীর যুদ্ধনীতি সম্পৃক্ত বক্তব্য "জিহাদের প্রতি উদ্যম ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ" স্লোগানে খাপ খায়। অর্থাত্ ইসলামী আন্দোলনে সামরিক এবং সামাজিক শক্তি প্রস্তুতির ভূমিকা অপরিসীম।

কাফী সাহেব যুদ্ধ-ইবাদতের বাইরেও শান্তিপূর্ণ প্রচারণার ওপর জোর দিয়েছেন। তার এক মূল্যবান শিক্ষায় বলা হয়েছে, মানুষের মন জয় করা যায় শুধু নৈতিক ও দার্শনিক চরিত্রের জোরে, বাহ্যিক শক্তি দিয়ে নয়। তিনি বলেন:

"মানুষের মনকে কষ্মিন কালে শক্তি আর লাঠির জোরে জয় করা যায় না, চরিত্রের মাহাত্ম্য দিয়ে জয় করা যায়।"
উক্তির প্রেক্ষাপটে বোঝা যায় কাফী আবেগপ্রবণ কথায় জোর দিচ্ছেন অপরাধকেও নীতিচেতনা এবং আদর্শমুলক গুণাবলীর সুবাদে পরাজয় করা সম্ভব। ইসলামে মহানবীর আমল ও সাহাবীদের চরিত্রের প্রশংসা বহুলাংশে আছে; কাফীর এই কথায় তা পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নির্যাতককে সঠিক পথ দেখাতে হলে কেবল বাহ্যিক জবর বা শোষণ নয়, বরং নৈতিক শিক্ষা ও আল্লাহর পথে আহ্বানই অধিক কার্যকরী। এই দৃষ্টিভঙ্গি চরিত্র-নির্মাণে গুরুত্বারোপ করে এবং ইসলামী রাজনীতি আদর্শগত শক্তিকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

চ) কাফী সাহেবের দর্শনের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহ.) ছিলেন বিশ শতকের এক বিরল প্রতিভাধর ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনৈতীক দার্শনিক। তাঁর জীবন ও দর্শন একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম ও রাজনীতি একে অপরের পরিপূরক। তিনি যখন বলেছিলেন, রাজনীতির প্রভাব কবরে প্রবেশের আগ পর্যন্ত এড়ানো সম্ভব নয়, তখন তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি চিরন্তন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।
আজকের প্রেক্ষাপটে, যখন মুসলিম দেশগুলো রাজনৈতীক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সম্মুখীন, তখন আল্লামা কাফীর "ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" এবং "ধন বণ্টনের রকমারি ফর্মুলা" নতুন করে পাঠ করা আবশ্যক। তাঁর সেই আপোষহীন তাওহীদী চেতনা এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যই পারে মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে। তিনি জীবন সায়াহ্নে এসেও যেভাবে একটি সঠিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সংগ্রাম করেছেন, তা বর্তমান প্রজন্মের রাজনৈতীক কর্মীদের জন্য এক পরম অনুপ্রেরণা।
পরিশেষে বলা যায়, কাফী সাহেবের রাজনৈতীক দর্শন আহলে হাদীস আন্দোলনের সম্পদ এবং সমগ্র বাঙালি ও ভারত উপমহাদেশীয় মুসলিম জাতির জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শিক ও সুস্থ রাজনীতির চর্চাই পারে একটি ইনসাফপূর্ণ রাষ্ট্র ও সুন্দর সমাজ গঠন করতে। আল্লামা কাফী কেবল ইতিহাসের এক অধ্যায় নন, বরং তিনি এক জীবন্ত আদর্শ, যা যুগ যুগ ধরে সত্যের অভিযাত্রীদের পথ দেখাবে।

কারাবরণ:

উপমহাদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে কাফী সাহেব সদা সোচ্চার ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে এবং জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নেবার আহ্বান জানাতে গিয়ে বারবার তিনি গ্রেফতার হন এবং কারাভোগ করেন। ১৯২৭ সালে অগ্নিঝরা - বক্তব্য দিতে গিয়ে মাওলানা প্রথম গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৩০ সালে মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে দিনাজপুরে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে এক বছরের কারাদন্ড দিয়ে আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩২ সালে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ঝটিকা সফরে বের হন এবং দিনাজপুরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গিয়ে পুনরায় কাফী সাহেব গ্রেফতার হন। প্রহসনমূলক এক বিচারে তাঁকে ছয় মাসের কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী (রাহ.) স্বভাবগতভাবেই ছিলেন সদালাপি এবং বন্ধু সুলভ ছিলেন। যে কোন বিরুদ্ধ ভাবাপণ্য লোক আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে তাঁর কাছে এলেও পরক্ষণে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুরূপে পরিণত হয়ে যেত। সততা কর্তব্য নিষ্ঠা ও অকুতোভয়তা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন; "সাধনা,সত্যনিষ্ঠ ও সৎ সাহসের যে নজির তিনি দেখাইয়া গিয়েছেন, তাহার তুলনা নাই।" তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল খুবই প্রবল ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত যে পর্যায়েই হোক না কেন কেউ কোন দোষারোপ করলে তিনি তার প্রতিবাদ করতন। জীবনে তিনি কখনো অন্যায় ও মিথ্যার সাথে আপোষ করেননি। এমনকি কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন তবুও তিনি কারা কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি।

তিনি সকলের প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন, তাঁর জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোন অতিথি তাঁর নিকট আসলে তিনি নিজেই তাদের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি খাদেম ও সেবকদের নিজের দস্তরখানায় বসিয়ে একসাথে আহার করতেন, নিজের মুখের গ্লাস তাদের দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

পরার্থপরতা গুণটিও আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) এর চরিত্রে পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। কেউ বিপদগ্রস্ত হলে তার বিপদ লাভের জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন।[আবুল মনসুর আহমাদ; আত্মকথা; ৩৩৯-৪১ পৃষ্ঠা]

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহ.) ছিলেন আত্মবিশ্বাসে অত্যন্ত দৃঢ় এবং সিদ্ধান্তে অটল। তিনি তার গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগে ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। ছোটখাটো মতভেদ ভুলে গিয়ে ইসলামের মৌলিক নীতির উপর সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল তার আন্তরিক প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্য জনসাধনের জন্য তিনি দেশের সকল দলের বিজ্ঞ আলেমদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের সহযোগিতা কামনা করতেন।

নিজের পরিবার না থাকলেও তিনি জমঈয়ত অফিসের সহকর্মী ও প্রেসকর্মীদের পরিবার-পরিজনের ভালো-মন্দের চিন্তা করতেন। তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন, তারাও তার প্রতি মুগ্ধ ছিল। শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ন ছিলেন, কোন অভিভাবক তার সন্তানকে মারধর করলে তিনি কষ্ট পেতেন।

তিনি খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছালো প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিত্ত থলির ব্যথা নিয়েও তিনি নিজ কাপড়চোপড় বই-পত্র, বিছানা গুছিয়ে রাখতেন। পারতপক্ষে এসব কাজে কারো সাহায্য নিতেন না। তাঁর মধ্যে যে বিশেষ গুণটি ছিল তা হল ধর্ম জ্ঞানের সঙ্গে কান্ডজ্ঞানের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমলের ও নবীনের সঙ্গে প্রাচীনের সমন্বয় সাধন ক্ষমতা। এজন্যই তিনি আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষায় সমাদৃত হয়েছেন। তিনি সর্বদা সর্বাবস্থায় নিষ্ঠার সঙ্গে রাসূল (সা.) এর সুন্নতের অনুসরণ করে পথ চলতেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষক প্রবীণ আলেম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি ভিন্নমতের প্রতি

ছিলেন অত্যন্ত সম্মানশীল, যেমন তিনি বলেন; ***“হানাফী মতালম্বী দিগকে ইসলামের বহির্ভুত বলার কোন আহলে হাদীসের অধিকার নেই।”*** [সাপ্তাহিক আরাফাত ৪ জুলাই ১৯৬০ বিশেষ সংখ্যা]

মাওলানা রাগেব আহসান এর বর্ণনায় আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর জীবনের অন্তিম মুহূর্তঃ

১৯৬০ সালের ২৪শে মে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের দুজন প্রতিনিধি (বংশালের রঈস হাজী মোহাম্মাদ আকীল এবং অধুনালুপ্ত দৈনিক নাজাতের প্রাক্তন সম্পাদক কাজী আবদুশ শহীদ) বক্ষমাণ প্রবন্ধের লেখকের ঢাকাস্থ গৃহে (২৫ নং মিঞা সাহেবের ময়দান) তশরিফ আনয়ন করেন। আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের সালাম এবং সংবাদ পৌঁছিয়ে তাঁরা বলেন, ‘তিনি পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আপনার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পিত্তশূলের বেদনা এবং রোগের তীব্রতার কারণে তাঁর পক্ষে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হয়ে উঠেনি’। আমি বললাম, ‘মওলানা সাহেবের অপারেশন এবং প্রতিকূল স্বাস্থ্যের সংবাদ আমি অবগত আছি। ইনশাআল্লাহ আমিই আগামীকাল তাঁর খেদমতে হাযির হব।

প্রতিশ্রুতি মত পর দিবস ২৫শে মে বান্দা ‘আরাফাত’ দফতরে গিয়ে হাজির হল। গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি শক্তিহীন এবং অত্যন্ত দুর্বল। তিনি বললেন, ‘অপারেশন বিফল হয়েছে, পিত্তকোষে কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বেদনা আগের চাইতেও বর্ধিত হয়েছে, দুর্বলতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা আমাকে পানি থেকে তীরে নিক্ষিপ্ত অসহায় মৎসের ন্যায় বিচলিত করে তুলেছে। পাকিস্তানকে একটি সেক্যুলার স্টেটে পরিণত করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে, সে দৃশ্য অবলোকন করে আমি কিছুতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছিনা। এখন শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া একান্ত আবশ্যক, এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ এবং সাহায্য একান্তভাবে কামনা করি।

পূর্ব দিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঢাকার কতিপয় চিন্তাবিদ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৬শে মে মওলানা সাহেবের রোগ প্রকোষ্ঠে একত্রিত হলেন। রাত্র ১১ ঘটিকা পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর দীর্ঘ আলোচনা চলল। মওলানা সাহেব অভিযোগ করলেন, এই ব্যাপারে কতিপয় স্থানে যাতায়াতের দৌড়ধাপে তিনি পুনরায় বেদনার ভাব অনুভব করছেন, জ্বরও এসে গিয়েছে, তবিয়ত তখন অনুকূল নয়- তাই তাঁর প্রস্তাব এবং সকলের সম্মতিক্রমে স্থির হ’ল মওলানা রাগেব আহসান সাহেব কমিশনের প্রশ্নাবলীর বিস্তৃত জওয়াব সহ একটি খসড়া প্রস্তুত করবেন। পরবর্তী ৩রা জুন ওলামা এবং সুধিবৃন্দের একটি বৈঠকের অধিবেশন হবে। ২৮শে মে মওলানা সাহেব বললেন, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মওলানা আকরম খানের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি তাঁর নিকট এবং আরও কয়েক জায়গায় ঘুরাফেরা করেছিলেন। ফলে তিনি জ্বরে আক্রান্ত এবং তাঁর পিত্ত প্রদাহ ও পিত্তশূল বর্ধিত হয়েছে। চিকিৎসকগণের নিষেধ অগ্রহ্য করেই তিনি একাজ করেছিলেন। ***কিন্তু ইসলাম আর পাকিস্তানের কোন সমস্যা যখন গুরুতর আকারে দেখা দেয় তখন নিজের স্বাস্থ্য আর জানের সম্বন্ধে একদম বেপরওয়া হয়েই তিনি কাজে নেমে পড়েন। কারণ সবকিছুর উর্ধ্বে মিল্লতের স্থান।*** প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ের এই অনুভূতির দ্বারাই তিনি পরিচালিত।

অতঃপর আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও প্রশ্নমালার উত্তর লিখতে বসে গেলেন, যদিও তাঁর পিত্তশূল ক্রমে বেড়ে চলেছিল। “***কিন্তু দেখা গেল মওলানা সাহেব তাঁর শয্যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেবিলে কেতাবপত্র সংস্থাপন করে লিখে চলেছেন ডাইন হাতে অবিরাম গতিতে কলম চলছে, বাম হাতে বক্ষদেশে বেদনাস্থল***

চেপে রেখেছেন, মাঝে মাঝে বেদনার অনুভূতি যখন সহ্য সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন হাত দিয়ে ডলা শুরু করছেন। এইভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল একদিকে শরীর অভ্যন্তরে পিত্ত বেদনা অন্যদিকে মিল্লতের জন্য তাঁর অন্তর বেদনা। দুই বেদনার তুমুল সংগ্রাম। আল্লাহর মনোনীত বান্দা আবদুল্লাহেল কাফীর অটল সংকল্প : তিনি তাঁর আরম্ভ কাজ সমাপ্ত করবেন, তবে উঠবেন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।।”

পয়লা জুন, ১৯৬০। জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারী মৌলবী মীযানুর রহমান বি.এ বি টি সাহেব উপরে এলে মওলানা সাহেবকে উপরোক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আরয করলেন, হযরত নিজের শরীরের উপর রহম করুন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল করুন, ডাক্তারের কড়া নির্দেশ; শরীরকে আরাম দিতে হবে।

মওলানা সাহেব উত্তর করলেন, *আপনাদের মুখে ঐ এক কথা : স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য। কিন্তু আমি স্বাস্থ্যের দিকে কি নযর দিব-এখন আমার জানেরও কোন পরওয়া নেই, সমস্তই পাকিস্তান ও ইসলামের জন্য উৎসৃষ্ট। এখন আপনি যান, নিচে গিয়ে দফতরের কাজ দেখুন, আমাকে আমার কাজ শেষ করতে দিন। এই বলে পূর্ববৎ বাম হস্তে বক্ষস্থলে জোরে চেপে ধরে অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় কাজ করে চললেন। কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের ৩৮টি জওয়াব পর একদম অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন।* বেদনার তীব্রতার অনুভূতিহীন ও শক্তিহারা অবস্থায় মেঝের উপর স্থাপিত পালঙে নিপতিত হলেন আর এই পড়াই তাঁর শেষ পড়া আর উঠতে সক্ষম হননি। ব্যাস! এই ছিল দুনিয়ায় তাঁর শেষ কাজ-অন্তিম কর্তব্য। ২রা জুন বেদনা তীব্রতর আকারে দেখা দিল, একেবারে বরদাশত সীমার বাইরে চলে গেল, দুর্বলতাও ক্রমে বর্ধিত হয়ে চলল। ডাক্তারগণ হৃৎপিন্ডকে অবসাদমুক্ত ও সবল রাখার জন্য শরীরে রক্ত দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ফল কিছুই হলনা। সংজ্ঞাহীনতা গভীরতার দিকেই এগিয়ে চলল।

৩রা জুন, শুক্রবার। আজ হজ্বে আকবর! আরাফাতের ময়দানে বিশ্ব মুসলিমের সম্মেলন দিবস! ঠিক এই দিবসেই মওলানা সাহেব কর্তৃক পরামর্শ সভার বৈঠকে আহুত। মওলানা সাহেবের মুদ্রিত দাওয়াতনামা পেয়ে বাঙ্গলার বিশিষ্ট আলেম, ফাযেল এবং চিন্তাবিদগণ রোগ প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন নব সংস্কৃতি বৃহত্তর প্রকোষ্ঠে সমবেত। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই মওলানার পার্শ্বদেশে সমবেত। কিন্তু হায়! আমন্ত্রণকারী এবং মজলিসের প্রাণ স্বয়ং মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যায় শায়িত-জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস তিনি টেনে চলেছেন। ডাক্তারগণ, উলামা, ফুযালা, বন্ধুবর্গ, ছাত্রবৃন্দ সকলেই তাঁকে ঘিরে আছেন। ডাক্তাররা জওয়াব দিয়ে বলে দিলেন, ব্যাস, মাত্র দু এক ঘন্টার মেহমান তিনি। সকলে সমস্বরে জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন মর্মবিদারক করুণ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি।

অতঃপর সকলেই বেদনা বিধুর অন্তরে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের জন্য মোনাজাত করলেন। বৈঠকের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ সাহেব আবেগ বিহবল অন্তরে মন্তব্য করলেন ‘এ এক পরম বাঞ্ছিত মৃত্যু! ইসলামের এবম্বিধ আযিমুশশান খেদমতে স্বীয় শক্তি এবং দেহের শেষ রক্ত বিন্দু ব্যয় করতে করতে নিজের আহূত সভার সম্মুখে জীবন দানের এমন অনুপম তওফীক অর্জন ক’জনের ভাগ্যে জুটে! দেখুন, ওর রক্তের সর্বশেষ কাতরাটিও ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হচ্ছে।

আমরা এ ধরণের আলোচনায় রত এমনি সময় মওলানা সাহেবের শয়ন কক্ষে হঠাৎ জোর ক্রন্দনরোল উত্থিত হ’ল। সকলেই বৈঠক ছেড়ে মওলানা সাহেবের কামরার দিকে ধাবিত হলেন, গিয়ে দেখলেন তাঁর চক্ষুদ্বয় বিস্ফোরিত, কন্ঠ নালিতে গোঁ গোঁ

শব্দের কাতরানি এবং তিনি সম্পূর্ণ মুচ্ছিত! একবার মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত নিঃসৃত হয়েছে। এর আগে আর কোন সময় রক্ত নির্গত হয়নি। ডাক্তার বলেছিলেন এ আর কিছু নয়, অভ্যান্তরীন রক্ত প্রবাহ। অন্যদের ধারণা অপারেশনের স্থানে সেলাই ছিড়ে গিয়েছে এবং সম্ভবতঃ সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে সকলেই নিরাশ হয়ে গেল। মজলিস তখন তখনই ভেঙ্গে গেল। সেদিন ছিল জুমার দিবস। আসরের ওয়াক্ত। শুক্রবার এভাবেই অতিক্রান্ত হ’ল। শনিবারের রাতও প্রায় শেষ হ’ল ইয়াওমুনন্নাহার (কুরবানীর দিবস) শনিবার ৪ঠা জুন, ১৯৬০ খৃ: ভোর ৪টা ২৫মিনিটে যখন মসজিদে মসজিদে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে গেছে, জামাত খাড়া হবে, এমন শুভ মুহূর্তে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল্লাহর আহবানে সাড়া দিলেন। তাঁর দাওয়াতে কবুল করে লাববায়েক বললেন। বাঙ্গালা তার প্রদীপ হারাল, পাকিস্তান আলোকশূন্য হ’ল। এলম ও দীনের মজলিস ভেঙ্গে গেল। ইসলাম জগত আজ এমন এক আলেম বাআমল, সত্য ও স্বাধীনতার জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ মুজাহেদ, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, প্রথিতযশা মুহাদ্দেস, মহামান্য মুফাসসের, অতুলনীয় তত্ত্ববিধ, ইসলামী শাসনতন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ, ঐন্দ্রজালিক বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, আপদমস্তক দরদে ভরপুর দেশপ্রেমিক, মিল্লতের বেলালী রূহ ও বজ্রগম্ভীর ব্যক্তিত্ব হতে চিরতরে বঞ্চিত হল। যিনি সারা জীবন লক্ষ লক্ষ অসাড় দেহে জীবনবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, সহস্র সহস্র আড়ষ্ট মস্তিস্ককে রওশনদীপ্ত ও বুদ্ধি সচেতন করে তুলেছেন এবং সংখ্যাতীত নওজোয়ানকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। (*ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন*)। [*তর্জুমানুল হাদীছের ৯ম বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা*]

উপসংহারঃ

আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী তাঁর সমগ্র জীবন দীন ও মিল্লাতের খেদমতে উৎসর্গ করেছিলেন। জাতির পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গতে তিনি সক্রিয়ভাবে আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিদেশী দাসত্ব থেকে মুক্ত না করে মানুষকে আল্লাহর দাস বানান যাবে না। বৈষয়িক উন্নতি চিন্তা তাঁকে টলাতে পারেনি। বহুমুখী প্রতিভার অভূতপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে উঠা এ অসাধারণ প্রতিভা এ দেশের জন্য একটি গৌরব। সেই সাথে এই মহান কর্মবীরের অনুপম অবদান এদেশের তাওহীদপ্রেমী জনতাকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে। তাঁর জীবন দর্শন, কর্ম এবং রচনাবলী নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণা হতে পারে। তাঁর রচনাবলী প্রকাশের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত যরুরী। আশার কথা হলো প্রচার বিমুখ এই মহান জ্ঞানতাপকে নিয়ে গবেষণা করে ইতোমধ্যেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হক। তার লেখনী কৌশল, দর্শন, সাংবাদিকতা, চিন্তা ধারা, সাহিত্য সাধনা, রাষ্ট্রচিন্তা, ইতিহাস দর্শন, ইত্যাদি সম্পর্কে আলাদা আলাদা গবেষণার দাবি রাখে। নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনাময় তরুণরা এ বিষয়ে আরও গবেষণা চালাবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করেই প্রবন্ধের ইতি টানছি।